১৬

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার

সন্তোষ ত্রিপুরা

পার্বত্য ও সমতল উভয় এলাকার আদিবাসী জনগণ এ বছরও ধারাবাহিক নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রথমে পার্বত্য এলাকার এবং পরে সমতল এলাকার আদিবাসীদের ভূমি অধিকার, নাগরিক অধিকারসহ আর্থ-সামজিক অবস্থার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

১০৭ ও ১৬৯ নম্বর আইএলও সনদ এবং সম্প্রতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ ঘোষণা দ্বারা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিস্তৃতভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ১০৭ নম্বর আই-এলও সনদ অনুস্বাক্ষর করে এবং এই সনদের ১১ অনুচ্ছেদ আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ভূমির ঐতিহ্যগত ব্যবহার স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশের সংবিধানও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ নিশ্চিত করে এবং বর্ণ, ধর্ম, জন্মস্থানসহ অন্যান্য বিষয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য করাকে নিষিদ্ধ করে।

এতদসত্ত্বেও ২০০৮ জুড়ে সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিসহ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে লেখালেখি হলেও তাদের অধিকারের সুনির্দিষ্ট লঙ্ঘন বিষয়ে নাগরিক ও গণমাধ্যমের মনোযোগ ছিল খুবই সীমিত আকারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গে আলোকপাত করবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বাধাগুলো হচ্ছে– সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি এবং দেশীয় পরিস্থিতির কারণে প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নিশ্চুপতা।

সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের ভূমি দখল, পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন করে সীমানা লঙ্ঘন,[১] পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া, বিশেষ করে বেসামরিক প্রশাসন পুরোপুরি সক্রিয় করতে ব্যর্থ হওয়া বা এ অঞ্চল থেকে সেনাছাউনি প্রত্যাহার না করা, অথবা ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বা উৎখাত হওয়া আদিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য পার্বত্য চুক্তি অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা এবং সেই সাথে পার্বত্য এলাকার ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত উদ্বেগ নিয়ে এই অংশে আলোকপাত করা হয়েছে। ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ার অপব্যবহার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে একটি চলমান উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ– ইকো পার্কের নামে রাষ্ট্রীয় উৎখাত প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী মানবা-ধিকারকর্মী সমতলের আদিবাসীদের (চলেশ রিছিল, পিরেন্‌্‌াল) বিচার-বহির্ভূত হত্যার জন্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া থেমে আছে অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামে জোরপূর্বক ভূমি দখলের প্রতিবাদ করতে গিয়ে গ্রেফতার ও গ্রেফতার-উত্তর নির্যাতনের শিকার হয়েছে এমন ব্যক্তিদের (রাংলাই ম্রো) মুক্তিদানের বিষয় এবং তাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়েও কোনো অগ্রগতি নেই। তবে এ বছর কিছু ইতিবাচক বিষয়ও লক্ষ্য করা গেছে। যেমন– পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক নেতা ও বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী রাজা দেবাশীষ রায়কে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া এবং এই নিয়োগ পরেই পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কের ওপর দীর্ঘকালীন নিষেধাজ্ঞা ত্বরিত তুলে নেয়া, জাতীয়ভাবে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পরে এ অঞ্চলে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠা এবং পার্বত্য ভূমি কমিশনকে পুনঃসক্রিয়করণের ঘোষণা ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

একটি সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী রাজা দেবাশীষ রায় আশা করেছিলেন যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল নেটওয়ার্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে।[২] এরই সূত্র ধরে ২০০৮ সালের ১৫ মে প্রধান উপদেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সদর দপ্তরে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইল

---

১ আদিবাসীদের ভূমি অধিকার বিষয়ে দেখুন : সনদ নম্বর ১৬৯-এর ১৪(১) অধ্যায় যেখানে স্থানান্তরিত কৃষিজীবীদের অধিকার বিষয়টিও বলা হয়েছে। এছাড়াও আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণার (অধ্যায় ১০) নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, বলপ্রয়োগ করে আদিবাসীদের ভূমি বা সীমানা থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না এবং আদিবাসীদের পূর্ব সম্মতির ভিত্তিতে যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাসমেত অবাধ চুক্তির ভিত্তিতে স্থানান্তর ঘটতে পারে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাদের আদি ভূমিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ রাখতে হবে।

২ 'সিএইচটি ফাইনালি কামিং আন্ডার মোবাইল নেটওয়ার্ক', *দি ডেইলি স্টার*, ২৯ মার্চ ২০০৮।

নেটওয়ার্ক উদ্বোধন করেন।[৩] এর ফলে এ অঞ্চলে এ যাবৎ কার্যকর একটি নিষেধাজ্ঞার সমাপ্তি ঘটে। যে নিষেধাজ্ঞার সাফাই হিসেবে নিরাপত্তার অজুহাত দেয়া হতো এবং মৌলিক যোগাযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হতো, অথচ দেশের বাকি অংশ যোগাযোগসহ সব সুবিধা ভোগ করত।

আদালত প্রতিষ্ঠা

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ হাইকোর্ট একটি রায়ের মাধ্যমে মাইলফলক স্থাপন করে যত শিগগির সম্ভব (সর্বোচ্চ এক বছরের মধ্যে) পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক তিনটি দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়। ২০০৮-এর ৪ জুন সরকার গেজেট প্রকাশ করে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন (সংশোধিত) আইন ২০০৩' ২০০৮ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর করার কথা ঘোষণা করে। এই আদালতগুলো যথাক্রমে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে স্থাপিত হয়। আশা করা হয় যে, সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি ঝুলন্ত মামলার শুনানি পার্বত্য চট্টগ্রামে আদালত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে শুরু করা যাবে।[৪] কিন্তু আদালতগুলো এখনো সশরীরে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন

তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল চলমান বিরোধ মীমাংসা করা এবং স্থানীয় ও আঞ্চলিক সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব, একটি ভূমি কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি, সেনা ক্যাম্প অপসারণ বা প্রত্যাহার, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং স্থায়ী বাসস্থানের ভিত্তিতে একটি পৃথক ভোটার তালিকা প্রণয়নের নিশ্চয়তা বিধান করা।

চুক্তির ১১ বছর পরে ২০০৮ সালে দেখা গেছে, পূর্ববর্তী বছরগুলোর মতো অসংখ্য প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও চুক্তির অঙ্গীকারগুলোর সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন হয়েছে সামান্যই।

- ২০০৮-এর এপ্রিলে সরকার[৫] ঘোষণা দেয় যে, ভূমি কমিশনকে পুনর্গঠন করা হবে, যা ভূমি কমিশন কার্যকর করার আশা যোগায়। ভূমি কমিশন

৩ 'সিএ ওপেনস সিএইচটি মোবাইল নেটওয়ার্ক', *দি ডেইলি স্টার*, ১৬ মে ২০০৮।

৪ *বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) বনাম বাংলাদেশ*, রিট মামলা নং ৬০৬/২০০৬, রায়ের তারিখ ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

৫ 'গভ. টু রিকন্সটিটিউট সিএইচটি ল্যান্ড কমিশন', *বাংলাদেশ নিউজ*, ১ এপ্রিল ২০০৮, দেখুন : ীীী.নধহমষধফবংযহবং.পড়স.নফ

২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও তখন পর্যন্ত অকার্যকর ছিল। যা হোক, বছরের শেষভাগ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত নতুন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

- পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর প্রতিটি সরকার নিযুক্ত পাঁচজন প্রতিনিধি নিয়ে কাজ করছে অথচ আইনের বিধান হলো এসব পরিষদ ৩১ জন সদস্য দ্বারা পরিচালিত হবে। অন্যদিকে এসব জেলা পরিষদের তদারকি ও সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক পরিষদ এখনো কার্যকর করা হয়নি।
- এ অঞ্চলের কোনো সেনা ক্যাম্প ২০০৮ সালে প্রত্যাহার করা হয়নি।[৬]
- উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এখনো শুরু হয়নি।
- যদিও পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্বতন্ত্র একটি ভোটার তালিকার কথা বলা হয়েছে, যেখানে শুধু স্থায়ী বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। কিন্তু সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ভোটার তালিকায় এই অঞ্চলে বর্তমানে বাস করছে এমন সব স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসিন্দাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সব নির্বাচনী আসনে একটি অভিন্ন ভোটার তালিকা থাকার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও অস্থায়ী বাসিন্দাদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য ২০০৭-এ উচ্চ আদালতের নির্দেশনার (দেখুন আশার রিপোর্ট ২০০৭) প্রেক্ষিতে ঐ অভিন্ন পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। তখন নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আঞ্চলিক পরিষদ ও এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার বা আঞ্চলিক কাউন্সিল নির্বাচনের আগে এই অভিন্ন ভোটার তালিকা সংশোধন করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি অধিকার

বিগত বছরগুলোর মতো এবারও ভূমি দখল ও আদিবাসী ভূমিতে বসতি স্থাপনের কিছু ঘটনা ঘটেছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। অভিযোগ এসেছে, খাগড়াছড়িতে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিতেই যখন নতুন পুনর্বাসিত বাঙালিরা একটি স্কুলের জমিসহ ৪০০ একর জমি দখল করে, এতে ১৩৩টি আদিবাসী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৭]

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য, বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন কিছু প্রতিষ্ঠান এবং করপোরেট গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই এলাকায় নতুন করে এক ধরনের অনুপ্রবেশ ঘটছে। তাদের দাবি, তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন এবং পর্যটন শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প এবং খামার শিল্পের উন্নয়নে কাজ করার জন্য এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, ডর্প (ডেভেলপমেন্ট অরগাইজেশন অব দি রুরাল পুওর) নামক একটি স্থানীয় এনজিওর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটা পরিচালিত হয়

৬ ইতোপূর্বে ৫০০টিরও বেশি সেনা ক্যাম্পের মধ্যে ৩০টি প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

৭ 'পরিকল্পিতভাবে আদিবাসীদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে', *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

নতুন বসতি স্থাপনকারী বাঙালিদের দ্বারা। অভিযোগ আছে, ‘ত্রিপুরা’ জনগোষ্ঠীর উৎখাত প্রক্রিয়ায় এবং বান্দরবানে এই জনগোষ্ঠীর দশ একর ফলের বাগান ধ্বংসের পেছনে ডর্প-এর হাত আছে।[৮] ঐতিহ্যবাহী জুম চাষের ওপর বন বিভাগের নিরবচ্ছিন্ন নিষেধাজ্ঞার ফলে জুম অর্থনীতি হুমকির মুখে এবং এ বছর রাঙ্গামাটির একশ’ খেয়াং পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে জীবনযাপনের অন্য পথ খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে।[৯]

বক্স ১৬.১ : সাজেকের ঘটনা

রাঙ্গামাটির সাজেক ইউনিয়নের ২০ এপ্রিল ২০০৮ আটটি আদিবাসী গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়ার ঘটনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ২০ এপ্রিল রাতে রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গামুখছড়া গ্রামে অজ্ঞাত হামলাকারীদের আক্রমণে অন্তত ১৩২টি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে এবং নয়জন আহত হয়েছে। রাত ৯টায় শুরু হয়ে এই আক্রমণ প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী স্থায়ী ছিল। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই আক্রমণকারীরা সরে পড়ে। ঘটনার পরে স্থানীয় প্রশাসন গ্রামে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী নিযুক্ত করে। গ্রামের বাঙালি ও আদিবাসী বাসিন্দাদের মধ্যে এখনো কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে পুলিশ বলেছে, অজ্ঞাত ১৫০ জনের একটি আক্রমণকারী দল লাঠি ও অস্ত্র সজ্জিত হয়ে ২০ তারিখ রাতে গ্রাম আক্রমণ করে। তারা গ্রামবাসীদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে, কয়েকজনকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে এবং এতে অন্তত ৯ জন আহত হয়। তারা গ্রামের ১৩২টি ঘর পুড়িয়ে দেয়, যার মধ্যে বাঙালিদের ৮৯টি আর আদিবাসীদের ৬৩টি ঘর ছিল।

হামলার পেছনের উদ্দেশ্য কী ছিল তা এখনো পরিষ্কার হয়নি। পুলিশের ভাষ্য মতে, বাঙালি ও আদিবাসী পরস্পরকে দোষারোপের প্রেক্ষিতে হামলাকারীদের আসল পরিচয় এখনো উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। অনেকে ইঙ্গিত করেছেন, স্থানীয়দের মধ্যে এই এলাকায় ভূমির জবরদখল নিয়ে ক্ষোভ বিরাজ করছিল।

এই ঘটনায় দুটি মামলা হয়েছে, যার একটি করেছেন বাঙালি বাসিন্দা নুরুল আলম[১০] এবং অন্যটি করেছেন আদিবাসী অনু চাকমা।[১১] নুরুল আলমের দায়ের

---

৮ ‘লামায় পুড়িয়ে দেয়া সেই বাগান : আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে নিজেদের শ্রমিক ঢুকিয়েছে বেসরকারি সংস্থা ডর্প’, *প্রথম আলো*, ২৭ জুলাই ২০০৮।

৯ ‘দুঃখ-দুর্দশায় দিন কাটছে রাঙ্গামাটির খেয়াং ও জুরির খাসিয়াদের’, *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট, ২০০৮।

১০ জি আর মামলা নং ১২১/২০০৮।

১১ জি আর মামলা নং ১২২/২০০৮।

১২ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) অভিযুক্তদের আইনি সহায়তা দিয়েছে।

১৩ আইন ও সালিশ কেন্দ্রের অনুসন্ধান প্রতিবেদন, অনুসন্ধানের তারিখ ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ২০০৮। আরো দেখুন : ‘১৩২ হাইজেস্ বার্নড ইন সিএইচটি আরসন অ্যাটাক : নাইন ইনজুরড’, *নিউ এজ*, ২২ এপ্রিল ২০০৮।

করা মামলায় ২৮ এপ্রিল গ্রাম থেকে তিন আদিবাসী যুবককে গ্রেফতার করা হয়। এক মাস পরে ২৯ মে তারা জামিন লাভ করেন।[12] গ্রেফতারকৃতরা হলেন– নোবেল চাকমা (বয়স ২৩ বছর), সুনীল চাকমা (বয়স ২২ বছর) এবং রতন বিকাশ চাকমা (বয়স ১৭ বছর)। এরা সবাই সাজেকের বামী বাইবাছড়া গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে অনু চাকমার দায়েরকৃত মামলায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি।[13]

আদিবাসীর ওপর চালানো একটি জরিপে দেখা যায়, তাদের শতকরা ৬১ জন কোনো না কোনো বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং শতকরা ৭৬ জন সহিংসতা ও হুমকির শিকার। যশোর, ময়মনসিংহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, গাইবান্ধা, জামালপুর, পাবনা, রাঙ্গামাটি, সিলেটে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ৩৩২ জন আদিবাসীর ওপর গত বছরের মার্চ থেকে এপ্রিলে জরিপটি করা হয়েছে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী শতকরা ১৮.৬৭ ভাগ আদিবাসী পূর্ব-পুরুষের ভিটা-ভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে, ৬.০২ ভাগ বিশ্বাস করেন, আদালতের মাধ্যম ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয় এবং ৫.৭২ ভাগ আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কেই জানেন না।[14]

লাদু মণি চাকমা

২০০৮ সালের আগস্ট মাসে 'আন্তর্জাতিক পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের' চট্টগ্রাম সফরের সময় আরো অনেক বিষয় সামনে চলে আসে। ৫০ বছর বয়সী লাদু মণি চাকমা ১৯ আগস্ট নিহত হওয়ার পর এ অঞ্চলে ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দেয়, যার প্রেক্ষিতে বহু আদিবাসী বাড়িঘর ছেড়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের রেতকাবা গ্রামের কুজি কুমার চাকমার ছেলে লাদু মণি চাকমা একদল বাঙালি অভিবাসীর হাতে খুন হন। ঐ দিন রাত দশটার দিকে মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে একদল বাঙালি অভিবাসী লাদু মণি চাকমার বাড়ি ঘিরে ফেলে। তাদের মধ্যে মুখোশ পরা তিন বাঙালি বাড়ির মধ্যে ঢোকে আর বাকিরা বাইরে থাকে। তারা লাদু মণি চাকমাকে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে। লাদু মণি চাকমার স্ত্রী চিকানপুদি চাকমা (শান্তি বালা, ৪৫) বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তার মাথায় ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। এরপর লাদু মণি চাকমাকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটি স্থানে নিয়ে নিষ্ঠুরভাবে কুপিয়ে হত্যা করে। স্বামী অপহৃত হওয়ার পরপরই চিকানপুদি ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান।

---

১৪ জরিপটি পরিচালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর ড. আসিফ নজরুল। দেখুন : '৬১পিসি ইনডিজেনাস পিপল ফেস ডিসক্রিমিনেশন : স্যাম্পল সার্ভে', *দি ডেইলি স্টার*, ২৭ জুলাই ২০০৮।

বাড়িতে অনুপ্রবেশকারী তিন বাঙালি অভিবাসীকে শনাক্ত করা হয়েছিল। এরা হলো– নাচোর আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী (২৮), আছানিয়া আলীর ছেলে জহর আলী (২৪) এবং জুলফু আলীর ছেলে নুরুল আলম (২৪)। গঙ্গারাম অঞ্চলের সেনা ক্যাম্পের মাত্র ৫০ গজ দূরে একটি স্থান থেকে লাদু মণি চাকমার লাশ উদ্ধার করা হয়। সেনাবাহিনী অনতিবিলম্বে লাশ নিজেদের হেফাজতে নেয় এবং ময়নাতদন্তের জন্য খাগড়াছড়ি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। ময়নাতদন্তের সময় সেনাবাহিনী হাসপাতাল ঘিরে রাখে এবং কোনো আদিবাসীকে হাসপাতালে ঢুকতে দেয়া হয়নি।

মোহাম্মদ আলী, জহর আলী ও নুরুল আলমসহ অন্য বাঙালি অভিবাসীদের আসামি করে চিকানপুদি চাকমা বাঘাইছড়ি থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মোহাম্মদ আলীকে গ্রেফতার করা হলেও পুলিশ অন্য অভিযুক্ত জহর আলী ও নুরুল আলমকে গ্রেফতার করেনি। তারা প্রকাশ্যে বাঘাইহাট বাজারে থাকছে এবং আদিবাসী গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। [১৫]

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অব্যাহতি

রাংলাই ম্রো এর ঘটনা

ইয়াম তুই ম্রোর ছেলে রাংলাই ম্রো (৪৩) হলেন ম্রো সম্প্রদায়ের একজন শ্রদ্ধাভাজন নেতা, পরিবেশবাদী এবং মানবাধিকারকর্মী। তিনি ম্রো সামাজিক পরিষদের সভাপতি, ম্রো সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং 'ম্রোচেট' নামের একটি স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। সুয়ালোক ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানও ছিলেন তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বন ও ভূমি অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির একজন নির্বাহী সদস্য হিসেবে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও দেশের অন্যান্য স্থানে বাঙালি-পাহাড়ি নির্বিশেষে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায় সক্রিয় আছেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে রাংলাই ম্রোকে তার উজানিপাড়া বাড়ি থেকে যৌথ বাহিনী গ্রেফতার করে। বাড়ি থেকে তাকে চোখ বেঁধে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে ব্যাপক নির্যাতন করা হয় বলে প্রকাশিত হয়। দুপুর ১২টার দিকে তাকে পুলিশ হেফাজতে হস্তান্তর করা হয় এবং পুলিশ তাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় বান্দরবান জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। বান্দরবানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় এবং ১৭ দিন সেখানে চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে পাঠানো হয়। হাসপাতালে

---

১৫ লেখকের কাছে সংরক্ষিত নথি।

থাকার সময় রাংলাই ম্রোর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় অকার্যকর হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, গ্রেফতারের সময় সে পুরোপুরি সুস্থ ছিল।

রাংলাই ম্রো পরে জানতে পারেন যে, তাকে বিশেষ মামলা নম্বর ১৩/২০০৭ (জিআর মামলা নং ৩১/২০০৭) এবং বান্দরবান থানায় নং ১১(২)০৭ মামলায় আসামি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৬ এপ্রিল ২০০৭ জরুরি ক্ষমতা বিধিমালার ১৯ ঞ(১) ও (৫) ধারা মোতাবেক চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার জরুরি ক্ষমতা বিধিতে মামলাটিকে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমোদন দেন।

মামলার এজাহার মতে, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ বান্দরবান সদর থানায় ১০৮০ নং সাধারণ ডায়েরির সূত্র ধরে মেজর এ বি এম মশিউল ইসলামের নেতৃত্বে যৌথবাহিনী ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে রাংলাই ম্রোর বাসা ঘিরে ফেলে এবং বাসা থেকে একটি দেশি পিস্তল, একে-৪৭ রাইফেলের ২৩ রাউন্ড গুলি, পিস্তলের এক রাউন্ড গুলি, একটি খেলনা পিস্তল, একটি এসবিবিএল বন্দুক ও এর বারো রাউন্ড গুলি জব্দ করা হয়। যা হোক, তল্লাশি ও জব্দ কোনোটাই আইনি পদ্ধতি অনুসরণ করে হয়নি বলে অভিযোগ আছে। তাছাড়া সাক্ষীদের ভাষ্য মতে, উদ্ধারকৃত পিস্তলটিতে গুলি ছোড়ার ট্রিগার নেই এবং সেটি অকার্যকর, উদ্ধারকৃত গুলিগুলো ইতোমধ্যে ব্যবহৃত, আর আছে একটি খেলনা পিস্তল। আর অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাগুলির লাইসেন্স আছে। এছাড়া রাংলাই ম্রোর বিরুদ্ধে অতীত কোনো মামলাও নেই। সাক্ষীদের ভাষ্য মতে আরো জানা যায়, তদন্তের সময় তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, এমনকি জোর করে সাদা কাগজে দস্তখত নেয়া হয়েছে।

১৩ জুন ২০০৭ আদালত রাংলাই ম্রোকে অস্ত্র আইনের ১৯(এ) ও ১৯(এফ) ধারা মোতাবেক দোষী সাব্যস্ত করে ১৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়। নাগরিক সমাজ এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো রাংলাই ম্রোর গ্রেফতার প্রক্রিয়া, জিজ্ঞাসাবাদকালীন অত্যাচার এবং বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে দেয়া একটি স্মারকলিপিতে তারা বলেন, রাংলাই ম্রো মারাত্মকভাবে অসুস্থ, তার হৃৎপিণ্ডের একটি ধমনি বন্ধ হয়ে গেছে অথচ তাকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে না এবং জেলে থাকা অবস্থায় তার স্বাস্থ্য সমস্যা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তারা আরো উল্লেখ করেন, ম্রোর গ্রেফতার ও আটক প্রক্রিয়া, পরবর্তী বিচারপ্রক্রিয়া এবং সর্বোপরি দণ্ডাদেশ ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে

মারাত্মক ব্যর্থতা। এই অবস্থায় তারা মামলাটিকে পুনর্বিবেচনা করার দাবি করেন।[১৬]

চলেশ রিচিল

মধুপুরের আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিল যৌথবাহিনীর আটকাবস্থায় মারা যায় ২০০৭ সালের মার্চ মাসে। দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও এই হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচারের জন্য সরকার কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি। মৃত্যুর পরে গঠিত তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ্যে আনা হয়নি। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মতে, চলেশ রিচিলের মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে তদন্ত কমিশন গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি; কিন্তু কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব চলেশ রিচিল, তার পরিবার, সব আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও বাংলাদেশের সব নাগরিকের ন্যায়বিচারের অধিকারকে অস্বীকার করার শামিল এবং এটা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।[১৭]

বক্স ১৬.২ : ভূমি দখলের জরিপ[১৮]
একটি জরিপে দেখা যায়, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা নিয়মিতভাবেই সমতলের আদিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করছে। ঐ জরিপ অনুযায়ী, জাল দলিল ও বলপ্রয়োগসহ নানাবিধ কৌশলে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো গরিব সংখ্যালঘু আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকদের জমি দখল করছে, আর সরকার দখল করছে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সরকারের তথাকথিত সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি ঐ অঞ্চলের আদিবাসী পরিবারগুলোকে ভূমিহারা করার সবচেয়ে বড় কারণ। জরিপের প্রাথমিক ফলাফলে দেখা যায়, দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দশ জেলার ১,৯৮৩ আদিবাসী সংখ্যালঘু পরিবার গত

---

১৬ 'বান্দরবান জেলাধীন ম্রো সামাজিক পরিষদ ও সুয়ালোক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব রাংলাই ম্রোর সুচিকিৎসা ও জরুরি ভিত্তিতে মুক্তির দাবিতে পেশ করা স্মারকলিপি', ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮।

১৭ 'আদিবাসী নেতা চলেশ রিছিলের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হোক', আসক প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৭ মার্চ, ২০০৮।

১৮ 'দি স্টেট অব ল্যান্ড রাইট অব ইনডিজিনাস পিপল', ২০০৮। ২০০৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর জরিপটি পরিচালিত করে যৌথভাবে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, ইনসিডিন বাংলাদেশ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ। জরিপের ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে ১১ মে ২০০৮ জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রকাশ করা হয়। দেখুন : আফিস নজরুল, 'এথনিক মাইনোরিটিস কনটিনিউ টু লস ল্যান্ড', *নিউ এজ*, ১১ মে ২০০৮; 'এথনিক মাইনোরিটি রাইটস টু অ্যানসেসট্রাল ল্যান্ড মাস্ট বি রেসপেক্টেড', *নিউ এজ*, ১২ মে ২০০৮।

কয়েক বছরে তাদের ১,৭৪৮.৩৬ একরেরও বেশি জমি হারিয়েছে। সবচেয়ে বেশি ১,১৮৫.৭৬ একর দখল করেছে বন বিভাগ, তারপরে আছে প্রভাবশালীরা। জাল দলিলের মাধ্যমে পূর্বপুরুষের ভিটামাটি থেকে প্রকৃত মালিকদের উৎখাত করে প্রভাবশালীরা দখল করেছে ৩৫৬.৭ একর। সর্বজনের ব্যবহৃত সাধারণ জমি, কবরস্থান এবং পবিত্র স্থানও দখলের হাত থেকে রেহাই পায়নি এবং দেখা গেছে, প্রতিটি আদিবাসী পরিবার কমবেশি এক একর জমি হারিয়েছে।

বেশিরভাগ আদিবাসী পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ। কিন্তু ভূমি দখল ও তাদের জীবনধারণের ঐতিহ্যগত উৎসগুলো হারানোর ফলে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনযাপন পদ্ধতি হুমকির সম্মুখীন। জরিপে দেখাযাচ্ছে যে, প্রভাবশালীরা নওগাঁ জেলার ২৮৫ আদিবাসী পরিবারের ভূমি দখল করেছে। প্রায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে নাটোর, বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলায়। শুধু দিনাজপুর জেলাতেই বন বিভাগ ৪১১ আদিবাসী পরিবারকে উচ্ছেদ করার মাধ্যমে ১,১৮২.০৭ একর জমি দখল করে।

সমতলের ভূমি দখল

বাংলাদেশি আদিবাসীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই বাস করে সমতল ভূমিতে, প্রধানত ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও বৃহত্তর সিলেটে। পার্বত্য এলাকার মতো সমতল এলাকার আদিবাসীরাও সমানভাবে ভূমি ও সম্পদ জবরদখলের শিকার হচ্ছে নিয়মিতই এবং তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার অস্তিত্ব হুমকির মুখে। আদিবাসী দিবসের মতো আন্তর্জাতিক কর্মসূচিসহ সবার যৌথ কর্মসূচি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতীয় রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো ক্রমেই দৃশ্যমান হতে শুরু করছে এবং তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা, স্থায়ী ভূমি কমিশন গঠন ও সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলোর জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় গঠনের দাবি উত্থাপিত হতে শুরু করেছে।

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার খাসি জনগোষ্ঠীর মতো কোনো কোনো এলাকায় ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাদ পড়া নতুন উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে।[১৯]

আদিবাসী সম্প্রদায়ের দাবিগুলোর প্রতি সরকারের দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া না থাকায় তাদের ভূমি জবরদখল ও নিরাপত্তাহীনতা আরো ব্যাপক

১৯ 'কুলাউড়ায় তিন শতাধিক আদিবাসী নিজ এলাকায় ভোটার হতে পারেনি', *প্রথম আলো*, ২৯ জুন ২০০৮।

আকার ধারণ করছে। নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলোসহ ২০০৮ সালেও এই ধারা অব্যাহত ছিল :

- শ্রীমঙ্গল ও হবিগঞ্জের খাসি জনগোষ্ঠীর প্রায় ১২০০ একর জমি দখল করা হয়েছে এবং বন বিভাগের সহায়তায় তাদের ৪,০০০ গাছ কেটে ফেলা হয়।[২০]
- ২৫ অক্টোবর নওগাঁর ৫২টি সাঁওতাল এবং ওঁরাও পরিবার অভিযোগ উত্থাপন করে, জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে সোনাপুর গ্রামে তাদের শ্মশানভূমি দখল করার চেষ্টা করছে স্থানীয় প্রভাবশালীরা এবং তারা এর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সরকারের প্রতি দাবি জানায়। নওগাঁর মেট্রোপলিটন প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তারা এই দাবি উত্থাপন করে। মান্দা উপজেলাধীন সোনাপুর গ্রামের ১৯ শতাংশ জমি আদিবাসীরা তাদের শ্মশান হিসেবে শতবর্ষব্যাপী ব্যবহার করে আসছিল। কিন্তু তারা অভিযোগ করেন, সম্প্রতি স্থানীয় কতিপয় প্রভাবশালী লোক, যাদের মধ্যে রাকিব প্রামাণিক ও রফিকুল প্রামাণিক উল্লেখযোগ্য, তাদের এই শ্মশানভূমি দখল করার চেষ্টা করছে। তারা আরো অভিযোগ করেন, তাদের এখানে শবদাহ করতে দেয়া হচ্ছে না, এমনকি তাদের হত্যার হুমকিও দেয়া হচ্ছে। পরে স্থানীয় আদিবাসী সংগঠন *লাহান্তি আক্রা* ফোরামের সভাপতি রঞ্জিত ওঁরাও মান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বি-পুল চন্দ্র বিশ্বাসের অফিসে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। নির্বাহী কর্মকর্তা ভূমি অফিসকে অভিযোগের তদন্ত করে তার কাছে তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দেন। আদিবাসী পরিবারগুলো আরো অভিযোগ করে, প্রভাবশালীরা জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে তাদের ৪.৩২ একর খাসজমি ও ৩.৪৩ একর খাস জলাশয় থেকে উৎখাত করার চেষ্টা করছে। তারা নিয়ামতপুর উপজেলাধীন বড়বাড়ি গ্রামে অবস্থিত এই জমি ও জলাশয় যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছে।[২১]
- ১ ফেব্রুয়ারি শামছুল আলম শামছু ও রুবেল আহমেদসহ স্থানীয় প্রভাব-শালীরা সিলেট জেলার গদাইহাট এলাকার লক্ষ্মী সাঁওতালের (৫৫) জমি দখল করে নেয়। ঘটনার পরে পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কিন্তু সে জামিনে মুক্ত হয়। পরে পুলিশ আর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।[২২]

---

২০ *দি ডেইলি স্টার*, ২৪ অক্টোবর ২০০৮।

২১ 'ক্রিমেশন গ্রাইন্ড অব ইনডিজিনাস পিপল গ্র্যাভড্', *দি ডেইলি স্টার*, ২৬ অক্টোবর ২০০৮।

২২ 'বেদখল হওয়া বাড়ি ফিরে পেতে চান লক্ষ্মী সাঁওতাল', *প্রথম আলো*, ৮ মার্চ ২০০৮।

- নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার আট পরিবারকে স্থানীয় প্রভাবশালীরা ১৫ এপ্রিল তাদের জমি থেকে উৎখাত করে। পরিবারগুলোর অভিযোগ, জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে স্থানীয় প্রভাবশালীরা তাদের উচ্ছেদ করে এবং তাদের বাড়িঘর ভেঙে ফেলে। তারা তখন খোলা আকাশের নিচে থাকতে বাধ্য হয়। ১৯৬৫ সাল থেকে তারা সেখানে বাস করছে। পুলিশ এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কিন্তু কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নেননি। [২৩]
- রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার পাকরি ইউনিয়নের ৩৭টি আদিবাসী সংখ্যালঘু পরিবার ৩০ অক্টোবর অভিযোগ করে, ভূমিদস্যুরা তাদের উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। রাজশাহী প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন, বাড়িঘর ছেড়ে না গেলে তাদের হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়া হচ্ছে। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুশেন কুমার শ্যামদুয়ার লিখিত বিবৃতি পাঠ করে বলেন, 'তারা (প্রভাবশালী লোকজন) ৩৭ পরিবারের ৩.৩৩ একর জমির জাল কাগজপত্র জোগাড় করেছে এবং পরে ঝামেলা এড়ানোর জন্য তাদের অনতিবিলম্বে স্বেচ্ছায় ভূমি থেকে চলে যেতে বলে।' তিনি আরো বলেন, 'আদিবাসী পরিবারের সদস্যদের হত্যা ও তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়ায় হুমকি দিয়েছে তারা।' এই ঘটনায় ১৯ জুলাই গোদাগাড়ী মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হলেও পুলিশ এখনো কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আদিবাসীদের অভিযোগ, জিডি করার পরে ৬ আগস্ট প্রভাবশালীদের পক্ষে কয়েকজন অস্ত্রধারী গ্রামে গিয়ে ডিসকো মারদি ও তার বাবার কাছ থেকে জোরপূর্বক সাদা কাগজে দস্তখত নেয়।[২৪]

অনুবাদ : এস. এম. রেজাউল করিম

---

২৩ 'নাটোরে আটটি আদিবাসী পরিবার খোলা আকাশের নিচে', *প্রথম আলো,* ৮ মার্চ ও ২২ এপ্রিল ২০০৮।

২৪ '৩৭ এথনিক মাইনোরিটি ফ্যামেলিস ইন ফিয়ার অব ইভিকশন ফ্রম দেয়ার ল্যান্ড', *নিউ এজ,* ৩১ আগস্ট ২০০৮।